মস্তানের ভাই

দেবাশিস গঙ্গোপাধ্যায়

সমীরণবাবুর দুই ছেলে। একজনের নাম বুলু, অন্যজনের নাম টুলু। সমীরণবাবু ওদের পোষাকি নামও দিয়েছিলেন। বুলুর ভাল নাম নিরুপম। টুলুর ভাল নাম অনুপম। যদিও ওদের পোষাকি নামে কেউ ডাকে না। এমন কি সমীরণবাবুও বহুকাল শোনেননি যদি কেউ তাকে নাম ধরে ডাকছে তিনি এখন সকলের কাকা অথবা জ্যাঠা। তাকে কেউ সনাক্ত করতে চাইলে বলে টুলু-বুলুর বাবা। ইদানিং টুলুর চেয়ে বলুর নামটাই বেশি শোনা যায়। বুলুর বাড়ির, বুলুর মা বুলুর বাবা বুলুর ভাই এ নামে লোকে সমীরণবাবুদের চেনে। সমীরণ সারা জীবনে বারোটা পাঠ্যপুস্তক লিখেছেন। দুটি কবিতার বইও করেছেন। তাতে তার যতটুকু পরিচিতি তার চেয়ে অনেক স্বল্প সময়ে অনেক বেশি নাম করে নিয়েছে বুলু। টুলু বংর অনেক বেশি নিষ্প্রভ, সাধারণ। ছোট ছেলেকে নিয়ে সমীরণ বাবুর দুশ্চিন্তা। টুলুর জীবনে কোন উচ্চাশা নেই, মোটামুটিভাবে জীবন কাটিয়ে দিতে পারলেই সে ধন্য হয়ে যায়।

পাঠক, বুঝতেই পারছেন। সমীরণবাবু যাকে নিয়ে ভাবছেন অর্থাৎ টুলু, সেই এ গল্পের প্রধান চরিত্র। বুলুর সঙ্গে তার প্রধান পার্থক্য বুলু মস্তান আর সে মস্তানের ভাই। টুলু অবশ্য এসব নিয়ে চিন্তা করে না। টুলু খুব তাড়াতাড়ি বুঝে গেছে সে বাবা বা দাদার মতো হতে পারবে না। বাবা সারাদিন ধরে বই পড়েন, টুলু সাতজন্মেও তা পারবে না। বই পড়তে গেলে তার ঘুম পায়। আর দাদার মতো হতে সে সাহস দরকার তা তার নেই। তাছাড়া দাদার পেশাটা ওর পছন্দ নয়। বুলুর ভ্রু সবসময় উঁচানো, চোখের মধ্যে রাগ - রাগ ভাব। চলাফেরার সময় হাতদুটো কেমন ছড়িয়ে হাঁটে বুলু। মস্তান হবার এগুলি বোধহয় প্রাথমিক লক্ষণ। দ্বিতীয় লক্ষণ শরীরের নানা অংশে কাটাছোঁর দাগ। বুলুর ডান হাতে একটা ভোজালির কোপের দাগ আছে। বেশ চওড়া দাগ। ওই দাগ দেখলে বুকের কাছে কিরকম গুড়গুড় করে টুলুর।

মস্তানের ভাই হবার সুবিধা-অসুবিধা দুই অনুভব করে টুলু সুবিদা হচ্ছে পাড়াঘরে খানিকটা খাতির পাওয়া যায়। কেরোসিন ডিপোর জগন্নাথের মুখ ভালো নয়। কাস্টমারদের সঙ্গে তর্কাতর্কি না করলে ওর গা ম্যাজ - ম্যাজ করে। কিন্তু টুলু গেলে ওর মুখচোখ একেবারে বদলে যায়। কখনও তাকে চা এনে দেয়। উপরি পাওনার মতো এসব খাতিরগুলো খুব ভালো লাগে টুলুর। না চাইতেই সে পেয়ে যাচ্ছে, এর চেয়ে ভালো কি হতে পারে?

কিন্তু অসুবিধ্য রয়েছে। বুলু দু-দুবার সোদাখালিতে হাঙ্গামা করল, তার রেজাল্ট হল ওরা বাড়ি চড়াও হয়ে বুলুকে না পেয়ে টুলুকে মারল। একবার তাকে থানায় একদিনের জন্য হাজতবাস করতে হয়েছিল। তবে পুলিশ অফিসারটি খুব খাতির করেছিলেন। ওর একটা উপদেশ মনে আছে বুলুর। পুলিশ অফিসার বলেছিলেন, —ভাই হাওয়া খুব টাফ মশাই, বিশেষ করে মস্তানের ভাই।

সে না বুঝতে পেরে জিজ্ঞেস করেছিল, —কেন?

—আপনি কিছু করুন বা না করুন বদনামের ভাগী হবেন। আবার সুনামও জুটবে না কপালে। সারাজীবন নিচু হয়ে চলতে হবে।

এগুলো কোনটাই নতুন কথা নয়, তবু টুলু চুপ করে থাকল। অফিসার গাল ঝেড়ে বললেন, —সবচেয়ে ভালো হয়, আপনি যদি আলাদা কোথাও চলে যান, আপনার কোন ঝামেলা থাকবে না। পাবলিকের মারধর খাবেন না।

টুলু এবার চোখ বড় করে তাকিয়েছিল। মোক্ষম উপদেশ।

—বাই দ্যা বাই, আপনার প্রেমিকার কি খবর। আই মিন, সুতপা?

তোতলাতে শুরু করেছিল টুলু, পুলিশদের কি চোখ মাইরি। সুতপা তার কবেকার কেস, সেটা অবধি এন্ট্রি করে রেখেছে। একটা ছোট অন্যায় সে সময় করেছিল টুলু। তাও কি ওরা মনে রেখেছে? টুলুর বুক ধড়ফড় করল। সে মাথা নিচু করে রইল।

—বুঝেছি, চোট খেয়েছেন। মেয়েটা আপনাকে বিশ্বাস করে নি? তাই না? অইফসার সমব্যথী সুরে বলেছিলেন।

টুলু আর কথা খুঁজে পায়নি। সে মনে মনে ভাবছিল অফিসার এসব কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন? এর সঙ্গে মস্তান দাদার কি সম্পর্ক আছে? টুলু অবশ্য সে কথা জিজ্ঞেস করতে সাহস পায়নি। পুলিশ বলে কথা।

পরে তা সে ভাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু মানে উদ্ধার করতে পারে নি। থানা থেকে ফেরার পর কদিন ভেবে ঠিক করেছিল একদিন অফিসারকে গিয়ে কথাটা জিজ্ঞেস করে আসবে। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠে নি।

আজ সকালে কথাটা ফের মনে পড়ল টুলুর। মনে পড়বার একটা কারণ আছে। কাল রাতে দাদা একটা মারাত্মক ঘটনা ঘটিয়েছে। কোত্থেকে একটা বউ যোগাড় করে এনেছে। এবং ঘোষণা করে দিয়েছে এ হল এ-বাড়ির বড় বউ।

মা কাঁদতে শুরু করেছিলেন, দাদার ধমকে চুপ করে বউটাকে বরণও করে নিয়েছিলেন। টুলু কিছুক্ষণ অবাক হয়ে দেখেছিল বউটাকে। নাম ইন্দ্রাণী। তার চেয়ে বেশ কমবয়সী হবে ইন্দ্রাণী। দেখতে শুনতেও মন্দ নয়। দাদার

সৌভাগ্য দেখে একটু হিংসেও হচ্ছিল তার। জানতে ইচ্ছে করছিল ইন্দ্রাণী কি দেখে দাদার জন্য পটে গেল।

ঘুম থেকে ওঠবার পর পাশের ঘরে ইন্দ্রাণীর গলা শুনে সুতপার কথা মনে পড়ল। তার প্রেমে পড়বার কোন যোগ্যতা ছিল না, সুতপাই তার প্রেমে পড়েছিল। কোন্নগরে সে সময় টুলু বিজনেস করার জন্য দৌড়াদৌড়ি করছে। হরেন সরকারের লোকাল মেড পাউডার ফেরি করতে হবে। স্টেশনারি দোকানে মাল বিক্রি করার পাশাপাশি ট্রেনেও দু-এক পিস ঝাড়ার চেষ্টা করেছে টুলু, সে সময় একদিন একটি মেয়ে তার কাছ থেকে পাউডার কিনল। কিছুদিন পর আবার। ততদিনে ওর নাম জেনে গেছে টুলু। তার সম্পর্কে ওর কৌতুহলও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতপা সম্পর্কে ভাসা - ভাসা জেনেছে টুলু। কলেজে পড়ে। বেশি কিছু জানতে চায়নি টুলু, যদি ওর সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করে সুতপা। কিছুদিন বাদে অবশ্য সুতপা জানতে চেয়েছিল, ঢোক গিলেছিল টুলু। কতটা বলবে কতটা বলবে না সে বুঝতে পারে না। এটুকু স্বস্তি, সুতপা এলাকার মেয়ে নয়, সুতরাং একটু-আধটু মিথ্যে বলা দোষের নয়। টুলু ভেবে দেখেছিল দাদার কথা বলা উচিত নয়। দাদাকে পুরো ভ্যানিস করাও সম্ভব নয়, টুলু বলেছিল, আমার দাদা বাইরে থাকে।

কিন্তু কেসটা অদ্ভুতভাবে কেঁচে গেল। সুতপা যে তার খোঁজে খুব তাড়াতাড়ি তাদের অঞ্চলে আসবে তা ভাবে নি। টুলু সে সময় বাড়ি ছিল না। ব্যবসার কাজে বাইরে গেছিল। পরের দিন দেখা হতেই সুতপা তার উপর ঝাঁপিয়ে উঠেছিল,— য়্যু ফ্রড। মিথ্যেবাদী। বাড়ি সম্পর্কে পুরো মিথ্যে কথা বলেছ।

কেন? কি হয়েছে? আমতা - আমতা স্বরে বলেছিল।

কেন মানে? স্টেশনে নামতেই একটা নচ্ছার লোক পেছনে লাগছিল। পরে শুনলাম ও নাকি তোমার দাদা। যার দাদা এসব করে তার সঙ্গে আমি বন্ধুত্ব করব। ছি! সুতপা আর কথা বাড়ায়নি।

লজ্জায় দু-কান লাল হয়ে গেছিল টুলুর। তার দু-চোখ নেমে এসেছিল অন্ধকার।

দুই

ইন্দ্রাণীকে বৌদি বলার কোন মানে নেই। তার চেয়ে অনেক ছোট, নাম ধরে ডাকাও ভাল দেখায় না। টুলু সে কারণে সম্বোধন করে না, এই - ওই বলেই চালিয়ে দেয়। বছরখানেক হতে চলল ইন্দ্রাণীর আসা। তাতে ওর সম্পর্কে একটা মিনিমাম আইডিয়া হয়েচে তার। দাদার সঙ্গে বনিবানা ছাড়া বাবা-মায়ের ব্যাপারে ইন্দ্রাণী ভীষণ কেয়ারিং, এবং খুব চটপটে। ইন্দ্রাণী টুলুকেও খুব চোখে চোখে রাখে। আগে কারণে অকারণে মরার মতো বিছানায় পড়ে থাকত টুলু। এখন তার হাত ধরে উঠিয়ে দেয় ইন্দ্রাণী।

সে বলে — আরে ডাকছ কেন? বাজার যেতে হবে?

—বাজার যাবার কথা বলেছি তোমাকে? অবেলায় উঠে বস!

—কাজ করবে! কেন তোমার পাউডারের ব্যবসা কি ফেল মেরে গেছে? সুতপা চলে যাবার পর ব্যবসা আর দাঁড়ায়নি। পুঁজিও বিশেষ নেই টুলুর। সে আনমনে মাথা নাড়ে।

—ঠিক আছে। বুঝেছি। শোন, ব্যবসা আবার শুরু কর। যা লাগার আমি দেব। টুলু নতুন করে ব্যবসা শুরু করেছিল। খুব তাড়াতাড়ি সে খেয়াল করেছিল ব্যবসায় সে মন দিয়ে খাটছে। এর পেছনে রয়েছে ইন্দ্রাণীর ব্যাপক উৎসাহ, সে তাকে দম ফেলবার ফুরসত দেয় না। সারাক্ষণ ও বিভিন্ন পরিকল্পনা করছে, তার পিছনে ছুটতে ছুটতে টুলু দেখল সে বেশ দাঁড়িয়ে গেছে। বাজারে দুটো স্টেশনারি দোকান তার রম রম করে চলছে।

সে রকমই এক সকালে টুলু দোকান খুলে বসেছিল। পুজো সেরে সে দিনের কাজ শুরু করে। ইন্দ্রাণীর জন্য তার মন খুব খচখচ করে।

বেচারি তেমন সুখ পেল না। ওদের কোন বাচ্চা হয় নি। ইন্দ্রাণী অবশ্য সে কথা শুনলে উড়িয়ে দেয়। বলে, দ্যাখো টুলু, যা হবার ভালই হয়েছে, ছেলে মেয়ে হলে বাবাকে দেখে কি খুব সুখে থাকত, বল?

টুলুও শ্বাস গোপন করে। তার মনের ভেতর ছায়া সরে যায়। সুতপার মুখ মনে পড়ে চকিগতে। দাদার জন্যই তো সে তার জীবন থেকে সরে গেল। এখন এসব মনে পড়লে টুলু কিছুক্ষণের জন্য উন্মনা বোধ করে। কাটিয়ে ওঠবার জন্য সে কাজে মন দেয়। আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখতে শুরু করে।

একটু পরে হঠাৎ দোকানের সামনে ঘ্যাচাং করে একটা পুলিসের গাড়ি থামে। দাদার কারণেই হোক অথবা অন্য কোন কারণে-টুলু বুঝতে পারল তাকেই নিয়ে যেতে এসেছে পুলিশ, প্রতিবারেই টুলু পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে, এবারও তাই করতে গেল। তাড়াতাড়িতে উঠে গিয়ে সে মোক্ষম একটা ধাক্কা খেল।

—হল্ট, দৌড়াচ্ছেন কেন?

টুলু দেখল সেই পুরানো পুলিশ অফিসার। সে খুব লজ্জা পেয়ে বলল, —না, মানে!

—মানে এখনও মনে মনে মস্তানের ভাই-ই আছেন তো? হোপলেস। আমাকে দেখে পালাতে চাইছেন?

টুলু চুপ করে রইল।

—দোকান বেশ ভালই সাজিয়েছেন দেখছি। পুলিশ অফিসার তারিফের চোখে চারদিক দেখতে দেখতে বললেন।

টুলুর মুখে সলজ্জ হাসি ফুটল।

—বিয়ে - থা করেছেন নাকি?

—উঁহু।

—ও। আপনার তো আবার সেই কেস। বলে পুলিশ অফিসার তাকালেন একদৃষ্টে।

টুলু চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল, এদিকে কোথাও যাচ্ছেন বুঝি?

—হ্যাঁ। রায়চকে কাল রাতে একটা ডাকাতি হয়েছে। সেটার তদন্তে যাচ্ছি। বাই দ্যা বাই, আপনার দাদা কোথায়? বাড়িতে না অন্য কোথাও?

টুলু এবার বুঝতে পারল অফিসারের আগমনের উদ্দেশ্য। তার মন তেতো হয়ে গেল। দাদা ডাকাতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে কিনা তা জানতেই উনি এসেছেন। কিন্তু এখনও কি দাদা এসব কাজে যুক্ত?

অফিসার বললেন, আপনার দাদাকে অ্যারেস্ট করতে আসিনি। উনি হয়ত দু-একটা নাম - ধাম বলতে পারবেন, সেজন্যই আসা। আপনার দাদা যে মস্তান নেই তা আমি জানি।

টুলু শুনে আশ্বস্ত হল। দাদার পক্ষে মস্তানি করা সম্ভব নয়। শেষবার মস্তানি করবার জন্য লোকেদের কাছে এমন মার খেয়েছিল যে বেঁচে ওঠা কঠিন ছিল। টুলু সে সময় জলের মত পয়সা খরচ করেছে। কোনভাবে বাঁচবার পর দাদা কিরকম যেন থম মেরে গেছে। টুলু দেখেছে দাদার গায়ে আর তেমন জোর নেই। হাত উঁচু করে রাখলে কনকন করে। ইন্দ্রাণী বলে, বেশ হয়েছে। ওই হাত দিয়ে কতজনকে মারধর করেছে, তার শাস্তি। ইন্দ্রাণী যেটা বলে নি তা টুলু একনিমেষেই বুঝে গেছিল। দাদার হাতের মার ইন্দ্রাণীর পিঠে, ঘাড়ে বিউটি স্পটের মতো ছড়িয়ে আছে।

—তবে একটা কথা, বলে অফিসার মৃদু হাসলেন, —আপনার দাদার মস্তান নাম কোনদিন ঘুচবে না। তেমনি সুতপার কাছে আপনি মস্তানের ভাই হয়ে থাকবেন।

সুতপা? ওর নাম শুনে টুলু আবার ঘাবড়ে গেল। বুকের মধ্যে কোন টরটরে পাখির মধুর সুর শুনতে পেল। চিক চিক করে উঠল দুই চোখ।

অফিসার শো-কেসের উপর আলতো করে ঝুঁকলেন, লাঠি নামিয়ে রাখলেন পাসে। সুতপার নাম শুনে অবাক হচ্ছেন? তাই না। ও আপনাদের দুজনের নামেই থানায় ডায়েরি করেছিল।

টুলুর বুক ধড়ফড় করে উঠল। সে অনুভব করল তার পা কাঁপতে শুরু করেছে। শক্ত করে সে সো-কেশ আঁকড়ে ধরল।

— না না, অত ভয় পাবার কিছু নেই। দেখুন আপনার দাদাকে তো আর কেস দিয়ে লাভ নেই। যা কেস খেয়ে আছেন তাতে এ জন্ম পার হয়ে যাবে। আর আপনাকে আমি চান্স দিয়েছি। কিন্তু আপনি কথার খেলাপ করেছেন।

টুলুর কিছু মনে পড়ল না। সে অপরাধী মুখে দাঁড়িয়ে রইল।

অফিসার ধমক দিয়ে উঠলেন, —স্বাবলম্বী হয়েছেন ভাল কথা, আপনাকে সে সময় বলিনি আলাদা হতে? বাঁচতে চান তো আলাদা হয়ে যান বুঝলেন? আমি আবার কদিন পরে আসব। মনে রাখবেন।

অফিসার চলে যাবার পরে টুলু থম মেরে বসে রইল। তার মাথা কাজ করছে না।

তিন

পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে টুলু ভেবে উঠতে পারল না সে কি করবে। মা-বাবা মারা যাবার পর বাড়িতে তারা মোটে তিনজন প্রাণী। দাদার জন্য নয়, ইন্দ্রাণীর জন্যই তার বেশি কষ্ট হচ্ছে। ইন্দ্রাণীর সঙ্গেই তার যত কথাবার্তা হয়। কিন্তু এই বিষয়টা নিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলার লজ্জার হবে। সে জানে ইন্দ্রাণী সহজ ভাবেই মেনে নেবে। ও নিজেও অনেকবার ওর ইচ্ছের কথা জানিয়েছে। বলেছে, টুলু, এবার তোমার বিয়ে দি। বিয়ে করার পর তুমি কিন্তু মোটেও এবাড়ির ছায়া মাড়াবে না।

—কোথায় যাব?

—যেখানে খুশি। এখানে থাকলে তোমার বউ কিছুতেই মানাতে পারবে না। মস্তান ভাসুরকে দেখেই ভিমরি খাবে। বলে দ্রুত চলে গিয়েছিল ইন্দ্রাণী। টুলু বুঝেছিল ইন্দ্রাণী কতটা কষ্ট গোপন করে আছে।

ছেড়ে চলে যাবার কথা ভাবলেই মন মুষড়ে উঠেছে তার। আজ সে যে দাঁড়িয়েছে তা যৌথ প্রয়াসের ফল। টুলুর পরিশ্রম ও ইন্দ্রাণীর বুদ্ধি! ভাগ করতে তার মন কিছুতেই চায় না। টুলু ভাবে, দাদা যদি একটু ভালো মানুষ হত, তাহলে এমন শ্রীহীন দশা মোটেই হত না। একই পরিবারের মধ্যে তারা মিলেমিশে থাকতে পারত। ইন্দ্রাণীর মতো শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু সে আর কোথায় পাবে? কয়েকটা দিন ভীষণ গুমড়ে কাটল টুলুর। সুতপার প্রতিশোধস্পৃহার কথা ভেবে তার রাতে ঘুম এল না। সে তো আর ওকে ডিস্টার্ব করেনি। তবু ওর নামে ডায়েরি করে গেছে সুতপা। পুলিশ অফিসারের উপর সে কৃতজ্ঞতা অনুভব করল। এতদিন তাকে তিনি নির্বিবাদে থাকতে দিয়েছেন।

দোকানে বসে থাকলে বুকের ভেতর ছমছম শব্দ হয়। কোন গাড়ির আওয়াজ হলেই সে ভাবে এল বুঝি অফিসার। রাত হলে সে অন্যমনস্কভাবে বাড়ি ফেরে। বাগানে, বাড়ির দেয়ালে, দরজায়, সে স্পর্শ করে। এগুলি ছেড়ে তাকে চলে যেতে হবে। টুলু নিঃশব্দ আর্তনাদে ককিয়ে ওঠে। একদিন ফেরার সময় টুলু হঠাৎ দাদার ঘরে ঢুকল। দাদা ঘরের ভেতর চুপ করে বসে রয়েছে। পায়ের শব্দ হতে দাদা গুরে তাকিয়ে বলল, —আয়!

দাদার চেহারা দেখে কি ভীষণ খারাপ লাগল টুলুর। দাদার দিকে সে বহুদিন তাকায়নি। কি ভীষণ রোগা হয়ে গেছে তার মস্তান দাদা। মুখচোখে কি রকম একটি বিধ্বস্ত ভাব। সে মায়াচোখে তাকাল। ফের সে চোখ বুজে বাইরে বেরিয়ে এল। না কিছুতেই সে মায়ায় জড়াবে না।

চার

কদিন পরে পুলিশ অফিসার এলেন। অদ্ভুত ব্যাপার, টুলুর এতটুকু ভয় হল না। সে সহজ চোখে অফিসারের দিকে তাকাল। পালাবার নামগন্ধ করল না। এই প্রথম তার মনে হয় অফিসারের বয়স হয়েছে, গোঁফ ঝুলপি পেকে সাদা। সে একটা চেয়ার এগিয়ে বলল, —বসুন। চা খাবেন?

—হুঁ। চা? খেতে পারি।

একজন কর্মচারীকে চা আনতে পাঠাল টুলু। নিজেও একটা চেয়ার পেতে বসল। অফিসার অবাক চোখে তাকে দেখলেন।

টুলু জিজ্ঞেস করল, ডাকাতির কিনারা করতে পারলেন।

—কিছুদূর হয়েছে। দু-চারজনকে ধরা বাকি আছে। হ্যাঁ, যে জন্য এসেছিলাম।

—পরে বলবেন। টুলু থামিয়ে দিল, —আগে চা খেয়ে নিন।

অফিসার মন দিয়ে চা খেলেন। তারপর ফুরক-ফুরুক করে আপনমনে হাসলেন।

টুলু অবাক হয়ে বলল, —হাসছেন কেন।

—তোমার পরিবর্তন দেখে।

—কিসের পরিবর্তন।

—আগে আমার দিকে সোজাসুজি তাকাতে না। কথা বলতে ভয় পেতে। এখন আর তোমাকে কারুর ভাই মনে হচ্ছে না। তুমি স্বয়ং টুলু। মাথা উঁচু করে কথা বলতে শিখেছ। দ্যাটস গুড। মাথা দুলিয়ে - দুলিয়ে অফিসার বললেন।

—আপনারও পরিবর্তন ঘটেছে। টুলু বল।

—কি?

—আপনি আমাকে আপনি বলতেন। এখন তুমি বলছেন।

—ইয়েস। তোমার ব্যাপারে আমি কনফিউজড ছিলাম। তাই।

—কি ব্যাপারে কনফিউজড? টুলু জিজ্ঞেস করল।

অফিসার প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেলেন। তারপর বললেন, —কি ঠিক করলে?

—আলাদা?

—হ্যাঁ। বাকি শর্তগুলো সব ঠিকঠাক আছে। এটা হলেই তোমার আর মস্তানের ভাই একথাটা পুরো মুছে যাবে।

টুলু অকম্পিতস্বরে বলল, —সরি। আমি আলাদা হতে পারব না।

—পারবে না?

—উঁহু। আমি ভেবে দেখলাম দাদা যখন মস্তান ছিল তখন সে একরকম। কিন্তু এখন দাদা ভীষণ অসহায়। তাকে ছেড়ে যাওয়া আমার কিছুতেই সম্ভব নয়।

—বাঃ, চমৎকার। অফিসার মুগ্ধ চোখে তাকালেন। —একটা খাঁটি মানুষের কথা শুনলাম আমি। চলি।

—সে কি? আমাকে আরেস্ট করলেন না? টুলু বিস্ময়ে চমকে উঠল।

—ও, অ্যারেস্ট! তাই তো! সেটা বাকি আছে না? অফিসার মৃদু হাসলেন। আজ সন্ধে বেলায় সুতপা তোমার বাড়িতে গিয়ে অ্যারেস্ট করবে! চলি!

টুলু চেয়ারে বসে থাকতে পারল না। সে লাফিয়ে উঠল। সুতপা একবার বলেছিল বটে তার বাবা একজন...।

এবার টুলু অফিসারের দিকে সোজাসুজি তাকাতে পারল না। সে চোখ নামিয়ে নিল।